অপ্রকাশিত কথোপকথন

আকিদুল ইসলাম

আকিদুল ইসলাম । অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী । বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময় লেখক হুমায়ুন আজাদের এক সময়ের প্রিয় ছাত্র । গুণমুগ্ধ । লেখকের সঙ্গে নানা সময়ে তার কথোপকথন হয় অন্তরঙ্গভাবে । দেশে এবং দেশের বাইরে । এমনকি হুমায়ুন আজাদের সেই মৃত্যুর দিনগুলোতেও । হুমায়ুন আজাদের স্মৃতি ও কথোপকথন নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি গ্রন্থ । অপ্রকাশিত সেই গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ পাঠকদের জন্য...

‘কোনো শক্তির কাছে আমি প্রার্থনা করিনি’

হুমায়ুন আজাদ ছিলেন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক । আমার জীবনের শিক্ষক । আমাদের জীবনের স্বপ্নলোক আর বেদনালোকের সমস্ত খবর ছিল তাঁর করতলে । তাঁর কাছে খবর ছিল আমাদের অন্তর্লোকেরও । তিনি সারাক্ষণ বলতেন, ‘বাংলাদেশে সম্ভবত আমার মতো আর কেউ লেখাপড়া, জ্ঞানচর্চা, সাহিত্য-শিল্পকলার জন্য এত পরিশ্রম করেন না । এটা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই, অন্যদের নানা কাজ আছে ।’

আগামীর স্টলে বসে এক বিকেলে বললাম, আপনার একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেয়ার বাসনা বহুকাল ধরে পুষে রেখেছি ভেতরে । ‘আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন’ পড়েছি; বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাগজে দেয়া সাক্ষাৎকার । এ জন্য অজস্র পুনরাবৃত্তি রয়েছে । আমি এককভাবে একটি সাক্ষাৎকার নিয়ে বই করতে চাই । পাতায় পাতায় আপনার ছবি আর নির্বাচিত উচ্চারণ দিয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে বইটি বের করব ।

হুমায়ুন আজাদ : তুমি আছ কতো দিন?

মেলা পর্যন্ত । মেলার জন্যই প্রতি বছর আসি ।

হুমায়ুন আজাদ : দীর্ঘ সময় নিয়ে এখন বসতে পারব না । মেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে ।

স্টলে বসেও আমরা প্রতিদিন কথা বলতে পারি । আর আমি আসলে স্যার, প্রথাগত কোনো সাক্ষাৎকার নিতেও চাচ্ছি না । প্রস্তুতি নিয়ে বসে কথা বললে কাউকেই নিবিড়ভাবে পাওয়া যায় না । আমি আপনাকে নিবিড়ভাবে ধরতে চাই । আপনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ত্রিশের প্রধান পাঁচ কবি, হাইনরিশ হইনে, বিশ্বসাহিত্য, বাংলা ভাষা, আপনার প্রবাদগুচ্ছ– এগুলো নিয়ে অজস্র কথা বলেছেন । আমি এসব কথা জানতে চাই না । স্বাভাবিক আলোচনায় প্রতিদিন প্রসঙ্গক্রমে যেসব ভাবনা আসে, আমি তাই জানতে চাইব । রেকর্ড করে নেব; নোট করে নেব । একবারে দীর্ঘ সময় বসে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব না । আমি আপনাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুডে পেতে চাই । আমি হুমায়ুন আজাদীয় অহংকারী কণ্ঠস্বর শুনতে চাই না, আমি আমার প্রিয় শিক্ষকের আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ কণ্ঠস্বর শুনতে চাই ।

হুমায়ুন আজাদ : বইটি ছাপার আগে পুরো পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখিয়ে নেবে ।

দেখাব । বইটির কয়েকটি নামও ভেবে রেখেছি; সর্বসাকুল্যে একজন, কেউ কেউ একা, কেউটে অরণ্যে নিষিদ্ধ তীরন্দাজ । আপনার কোনটি পছন্দ?

পাঠকের কেনা ‘নারী’ গ্রন্থে অটোগ্রাফ দিতে দিতে বললেন, কেউটে অরণ্যে নিষিদ্ধ তীরন্দাজ ।

‘নারী’ বইটির দিকে চোখ রেখে আমি বলি, নারীদের জন্যে এমন বই আর কেউ লিখতে পারেননি । স্যার প্রতিবাদ করে ওঠেন, এ বইটি নারীদের চেয়ে পুরুষদের পড়াই বেশি জরুরি । এটি নারীগ্রন্থ নয় ।

নারী প্রকাশের প্রায় চার বছর পর সরকার বইটি নিষিদ্ধ করেছিল । তখন আপনার মনের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল?

হুমায়ুন আজাদ : আমার কাছে খুবই হাস্যকর মনে হয়েছিল । আমি কখনোই মনে করি না, আমার বইটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল । যারা নিষিদ্ধ করেছিল তাদেরকেই নিষিদ্ধ মনে হয়েছে । জীবন মৃত্যুর মতো ব্যাপার যেখানে রয়েছে, সেখানে বই নিষিদ্ধ কোনো ভীতিকর নয় । যুগে যুগে মেধাহীন সরকারেরা মেধাসম্পন্ন লেখাগুলো বাতিল করেছে । আমাদের ক্ষমতাসীনরা মগজহীন, বিবেচনাহীন এবং জ্ঞানের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই । এখন এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠী । এরা একদিন থাকবে না । কিন্তু বাঙালিরা কয়েক হাজার বছর আমাকে নিয়েই কাটিয়ে দেবে ।

নারী ছাড়া আপনার আর কোনো বই পাঠকপ্রিয় নয় ।

হুমায়ুন আজাদ : আমার বইগুলো পাঠকপ্রিয় নয় বলেই আমি উল-াস বোধ করি । আমি চাই না নবম-দশম শ্রেণীর বালক-বালিকারা আমার বইগুলো সংগ্রহ করুক এবং পড়ুক । আমার সবগুলো বইই গুরুত্বপূর্ণ । এ রকম উৎকৃষ্ট, চিন্তামূলক বই যারা কিনতে পারত, তারা বই কেনে না এবং পড়ে না । আমাদের সমাজ যারা চালায় তারা বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না । বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সচিব, রাজনীতিক সম্প্রদায়, মন্ত্রী, আমলা,

জেনারেল, ব্যবসায়ী এরা সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার বাইরে চলে গেছে। এরা টাকা-পয়সা, কালোবাজারি, ঘুষ-দুর্নীতিতে এতটা লিপ্ত হয়ে গেছে যে, এদের বইয়ের জগতে টেনে আনা অসম্ভব ব্যাপার। আমাদের জাতীয় সংসদের কজন সদস্য বই পড়েন? এ সমাজ অত্যন্ত দূষিত, অত্যন্ত নষ্ট। এখানে সমাজের সফল মানুষগুলো, যারা ছাত্রজীবনে প্রচণ্ড মেধাবী ছিল এখন তারা বদমাইশ। বইয়ের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের তেরো কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার পাঠক আছে, যারা মূল্যবান বই পড়ে। এরা জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যর্থ মানুষ। এই ব্যর্থ মানুষগুলোই মননশীল মানুষ। নানা কারণে দেশের শিক্ষিত মানুষদের মগজ পচে গেছে। এরা রুচিশীল কোনো বইয়ের খবরই রাখে না।

আপনার 'সব কিছু ভেঙে পড়ে' উপন্যাসে কাবিননামার বিপক্ষে কথা বলেছেন। প্রচলিত বিবাহ প্রথাকে অস্বীকার করেছেন।

হুমায়ুন আজাদ : এ উপন্যাসটির বিষয় হচ্ছে আমাদের অঞ্চলের বিবাহ প্রথার ব্যর্থতা। কয়েক হাজার বছর ধরে যে প্রথা চলে আসছে তা কিন্তু নারী-পুরুষের মধ্যে গভীর কোনো মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি। আধুনিক ভাবনায় এ প্রথা বাতিল। বিয়েতে প্রেম টেকে না। প্রেম এমন একটা তীব্র অনুভূতি যা টিকিয়ে রাখার জন্যে পরস্পরকে ব্যাকুল থাকতে হয়। বন্ধন মানুষের আবেগ নষ্ট করে দেয়। বিবাহিত জীবনে সংসার, সন্তান এবং পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাসের ক্লান্তি সব চাঞ্চল্য ম্লান করে দেয়। কেউ স্বামী বা স্ত্রীর জন্য গভীর আবেগে কাঁপে না কিন্তু প্রেমিক বা প্রেমিকার জন্যে কাঁপে। আমি একটি মুক্ত সমাজব্যবস্থা চাই। আমাদের এখানে যদি প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর নিজস্ব গৃহ থাকত, তাহলে অনেক নিষেধ তারা অমান্য করতে পারত। তোমাকে একটি গল্প বলি, আমার এক ছাত্রীর সঙ্গে আমার বহু বছর পরে দেখা হলে জানতে চাই, কেমন আছ? সে বলে ভালোই আছি, কারণ আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে। আমি বলি, অভিনন্দন। মেয়েটি খুশি হয়ে বলে, আমার খুব ভালো লাগছে স্যার, কারণ এর আগে আর কেউ আমাকে এ জন্যে অভিনন্দন জানায়নি।

প্রথাগত বিবাহ পদ্ধতির ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমি একমত। বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী অস্ট্রেলিয়াতেও উদ্ভাসিত নয়। বিয়ের কয়েক বছরের ভেতরেই তারা নিভে যেতে থাকে।

হুমায়ুন আজাদ : আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিবাহ প্রথা উঠে যাবে। প্রথাগতভাবে কেউ আর স্বামী-স্ত্রী থাকবে না। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কামকে উপভোগ করতে জানে না। এ জন্যেই বাঙালিরা কামে অতৃপ্ত জাতি। আমি 'নারী' লেখার সময় অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, সকলেই কামে তাদের অতৃপ্তির কথা বলেছে। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা কিংবা ইউরোপে একটি পুরুষ ও নারী খুব সহজেই মিলিত হতে পারে। ওদের প্রত্যেকেরই নির্জন, নিজস্ব কক্ষ রয়েছে। অধিকাংশ বাঙালির তা নেই।

ব্যক্তিগতভাবে স্যার আপনি কেমন জীবনযাপন করছেন? আপনার জীবনে আসা পরনারীদের কথা জানতে চাই।

হুমায়ুন আজাদ : পরনারী শব্দটি আমার পছন্দ নয়। আমি কখনো অন্যের সামগ্রীতে হাত দেই না। যারা এসেছে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে এসেছে। সেই আসার কোনো তুলনা নেই। নারীর শিল্পকলায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। কবিতার থেকেও শিল্পিতভাবে নারী এসেছে আমার জীবনে। নারীর কণ্ঠস্বর আর শরীরের নান্দনিকতায় আমি বাল্যকাল থেকেই কাতর। আমি একের অধিক নারীর প্রতি আবেগ বোধ করেছি। একের অধিক নারী আমার প্রতি আবেগ বোধ করেছে।

আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করতে চাই, সম্ভবত আপনি বিরক্ত হবেন। অনেক দিন ধরেই প্রশ্নটি আমাকে ঘুণপোকার মতো কাটছে। আমাদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় ও যন্ত্রণাময় ইতিহাস একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। সেই যুদ্ধ নিয়ে আপনার কোনো বড় কাজ নেই। কেন?

হুমায়ুন আজাদ : আমার একটি উপন্যাস আছে। গভীর অর্থময় উপন্যাস।

'আব্বুকে মনে পড়ে'। কিশোর-কিশোরীদের জন্যে লেখা; সেখানে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে, কিন্তু বাঙালির জীবনের সবচেয়ে মহৎ ও গৌরবময় যুদ্ধের কাহিনী, ভয়াবহতা আর সময় প্রধান হয়ে ওঠেনি; প্রধান হয়ে উঠেছে এক কিশোরের নিজস্ব বেদনাবোধ। যে আমাদের মহাযুদ্ধের সময়ে ছিল শিশু। তার আব্বু যুদ্ধে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। গোটা উপন্যাসে আব্বুর জন্যে ওই কিশোরের হাহাকার আর অপেক্ষাই বারবার আমাদের কাতর করেছে। মুক্তিযুদ্ধকে সেখানে বড় করে পাই না।

হুমায়ুন আজাদ : তুমি আমাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কথা বের করতে চাচ্ছ, কিন্তু আমি তো শামসুর রাহমান নই যে, কথা বলার জন্যে নিরাপদ দূরত্ব খুঁজব। শামসুর রাহমানের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছিলাম। সেখানে তাঁকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বের করতে হয়েছে। তিনি সব সময়ই একটি গোষ্ঠী, তাঁর নিজের অবস্থান এবং পাঠকদের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন। খুব সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে চান। এ দেশে সবাই সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে চায় বলে সত্য কথা বলে না। আমি তো সুবিধা চাই না। জাতীয় অধ্যাপক ড. রাজ্জাকের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি জীবনে কোনো নারীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন কিনা, যেহেতু তিনি ছিলেন চিরকুমার। তিনি অস্বীকার করেছেন। আজ আমি তার কথা বিশ্বাস করি না। তিনি আসলে সামাজিকতার ভয়ে ভীত ছিলেন।

আপনিও স্যার আপনার জীবনে নারীদের সম্পর্কে কিছু বলেননি।

হুমায়ুন আজাদ : আমি যেটুকু বলেছি সেটুকুও এখানে কেউ বলে না।

আমার স্যার মনে হয়েছে, আপনি যেভাবে সবকিছুকে উপেক্ষা করেন, পাত্তা দেন না, ঠিক সেভাবেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধকেও উপেক্ষা করেছেন, পাত্তা দেননি। সবকিছুকে তুচ্ছ ভাবার আপনার একটি ভয়ানক প্রবণতা আছে।

হুমায়ুন আজাদ : না না, এটা ঠিক নয়। মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বিশাল কোনো বই লিখতে হলে যে অভিজ্ঞতা দরকার তা আমার নেই। আমি অন্যদের মতো মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবসার উপকরণ বানাতে চাই না। এখানে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উপন্যাস লিখেছে, স্মৃতিকথা লিখেছে। তাদের কোনো লেখাই লেখা হয়ে ওঠেনি। কেউ লিখেছে ব্যবসার জন্যে আর কেউ কেউ নিজেকে মহাপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। একটি বইও নেই যেখানে প্রকৃত মহাযুদ্ধকে পাওয়া যাবে। এসব বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ মানেই হিন্দু রমণীদের ধর্ষণ, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া। আমি ওভাবে লিখতে চাই না। আবেগ নিয়ে লিখতে চাই না। যদি লিখি, আমি লিখব বাঙালির মনের পরিবর্তন আর চেতনার পরিবর্তন কিভাবে তাকে মহাযুদ্ধের দিকে নিয়ে গেল। আমি অজস্র ঐতিহাসিক চরিত্র আনব। এরা যে সবাই মহামানব হবে, যেভাবে এখন এদের দেখানো হচ্ছে আমি হয়তো সেভাবে তাদের দেখাতে পারব না। এটি হবে বিশাল উপন্যাস। তাতে ব্রিজ ভাঙা, ধর্ষণ বৃত্তান্ত থাকবে না। এ সময়ের ইতিহাসও আসবে। অনেক হইচই হবে। গোলমাল হবে। আমি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস লিখলে মহা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। দুই উরুর মাঝখানে বালিশ নিয়ে উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখব না। আমি লিখলে খনি শ্রমিকের মতো পরিশ্রম করে লিখব।

২০০৪-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে ফোন আসে আমার ঘরে, অস্ট্রেলিয়ায়। জানতে পারি, আমার প্রিয় শিক্ষক হুমায়ুন আজাদ আহত হয়েছেন 'পাক সার জমিন সাদবাদ'-এর গুপ্তচরদের চাপাতির আঘাতে। মেলা থেকে ঘরে ফিরছিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ওসমান গনির মোবাইলে কথা বলি। তিনি জানান, ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সম্মিলিত সামরিক হসপিটালে। সেখানে কাউকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। বেঁচে আছেন কিনা সেটাও জানা যাচ্ছে না।

জ্বলে ওঠা মানুষের কাছে নতজানু সরকার আততায়ীদের চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত লেখক হুমায়ুন আজাদকে ২২ মার্চ উন্নত চিকিৎসার জন্যে থাইল্যান্ডে পাঠায়। ব্যাঙ্ককের বিখ্যাত বামরুনগ্রাদ হসপিটালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। আমি ফোন করি হসপিটালে। তাঁরা জানায়, হুমায়ুন আজাদ নামে কেউ নেই এখানে। ফোন করি বাংলাদেশ দূতাবাসে; তারা বলে, তাঁর সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না আমরা, উপরের নির্দেশ আছে। আমার বউয়ের বড়ো ভাই ব্যাঙ্কক প্রবাসী ইসতিয়াক আহমেদ দুলালকে বলি, আপনার প্রিয় লেখক এখন ব্যাঙ্ককে, বামরুনগ্রাদ হসপিটালে। তাঁর রুম নম্বরটি আমাকে জানান। বিকেলে তিনি আমাকে ফোন করে ওসমান গনির হোটেলের নম্বর দিয়ে বললেন, বাংলাদেশ দূতাবাস আর থাই পুলিশের কড়া নিরাপত্তায় রাখা হয়েছে স্যারকে, তুমি গনি ভাইকে ফোন করলেই সব জানতে পারবে।

আমি ফোন করি গনি ভাইকে।

ওসমান গনি আমাকে স্যারের রুম নম্বর দিলেন।

বিকেল চারটায় স্যারের রুমে রিং বাজলে ওসমান গনি ধরলেন। বললেন, স্যারের সঙ্গে কথা বলেন। বেশি সময় নেবেন না। একটু পরেই চেকআপে যেতে হবে। প্রতিদিন তিন-চারবার চেকআপ করছে।

হুমায়ুন আজাদ : কেমন আছ?

আপনার জন্যে খুব উদ্বিগ্ন আছি, স্যার।

হুমায়ুন আজাদ : আমার জন্যে উদ্বিগ্নতার কিছু নেই। আমি ভালো আছি। আমি তো নতুন করে জন্ম নিয়েছি। ২৭ ফেব্রুয়ারি আমার মৃত্যু হয়েছিল। এখন যে জীবন আমার তা নতুন জীবন। এ জীবনে আমি আরো ভালো আছি।

সবচেয়ে ভালো লাগছে এই ভেবে যে, আমার মগজ নষ্ট হয়ে যায়নি। আমি আবার লিখতে পারব। আমি তো এখনই থেমে যেতে চাই না। আরো বেঁচে থাকতে চাই। আরো লিখতে চাই।

কেউ কেউ বলছেন, আপনার ওপর যে আক্রমণ করা হয়েছিল তা ছিল মূলত মুক্তচিন্তার মানুষদেরকে ভয় দেখানোর জন্যে। আবার কারো কারো বক্তব্য, আপনাকে জবাই করে হত্যা করতে চেয়েছিল ঘাতকেরা। আপনার ওপর তাদের হামলার যে ধরনটি ছিল তাতে আপনার কী মনে হয়েছে?

হুমায়ুন আজাদ : কেউ কেউ বলছেন ভয় দেখানোর জন্যে হামলাটি করা হয়েছে– তাই তো? এই কথাটিই নির্বোধের মতো কথা। সম্পূর্ণ নির্বোধের। ভয় দেখানোর জন্যে যদি হয় তাহলে সবচেয়ে ভালো পন্থা খুন করা। আসলে তারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে খুনই করতে চেয়েছিল। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং মননগতও বটে। যারা প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা করে তাদের ধ্বংস করা। আর এই প্রগতিশীলদের মধ্যে আমিই যেহেতু ভিন্ন ধরনের এবং একলা; স্পষ্ট কথা লিখি এবং বলি যা বাংলাদেশে আর কেউ করে না, কাজেই আমার ওপরই আক্রমণটা এসেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমাকে হত্যা করাই তাদের লক্ষ্য ছিল। আর এই হত্যা যদি করতে পারত তাহলে দেশের বুদ্ধিজীবীরা ভয়ে চুপ করে যেত। এখনো ভয়ে রয়েছে। কারণ তারা এখনো নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। তারা সহজে নিষ্ক্রিয় হবে না যদি না সরকার তাদের নিষ্ক্রিয় করে।

আপনার একটি উচ্চারণ আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। সেটি ছিল এরকম– 'সবচেয়ে হাস্যকর কথা হচ্ছে একদিন আমরা কেউ থাকব না'। এর মানে আপনি মৃত্যুকে নিয়ে ভাবেন।

হুমায়ুন আজাদ : মৃত্যুকে কেউ ভুলে থাকতে পারে না, আমি তো শিশুকাল থেকেই ভাবি। ভয়ে ছেলেবেলায় মাকে জড়িয়ে ধরতাম। যৌবনে চারদিকে দেখতাম মৃত্যুর মুখ। তাকে এড়ানোর জন্যে তাকাতাম সৌন্দর্যের দিকে। এখন অভিজ্ঞ হয়েছি, জীবনের সারকথা অনেকটা বুঝেছি, এখন মৃত্যুর কথা ভাবলে সভ্যতা, শিল্পকলা, বিজ্ঞানকে হাস্যকর মনে হয়। তবু নিরর্থকতাকে অর্থময় করতে চাই শব্দে ও বাক্যে। মৃত্যুকে নিয়ে আমার একগুচ্ছ কবিতা আছে 'হুমায়ুন আজাদের মৃত্যুভারাতুর কবিতাগুচ্ছ'। আমরা শূন্যতার মধ্যে আছি, শূন্যতার দিকে এগোচ্ছি, 'যেখানে পশুর পায়ের দাগ আর ফুল একই অর্থবহ'।

আপনি আপনার অজস্র লেখায় ও সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বেঁচে থাকার জন্যে আপনার কোনো ব্যাকুলতা নেই। আমি জানতে চাই, যখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিলেন তখন কি বেঁচে থাকার কাতরতায় কোনো শক্তির কাছে প্রার্থনা করেননি?

হুমায়ুন আজাদ : না, না। কোনো শক্তির কাছে আমি প্রার্থনা করিনি। এমনকি হসপিটালের চিকিৎসকরা আমার জ্ঞান ফেরার পর আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, স্যার– আল-হর রহমতে আবার আপনি ফিরে এসেছেন। আল-হ আপনাকে বাঁচিয়েছেন। আমি চুপ করে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। আমি তাদেরকে আহত করতে চাইনি। তারা শান্তি পাচ্ছে; তাদের বিশ্বাস থেকে তারা বলছে। আমি কিন্তু তাদের সাথে একমত হইনি। আমি চুপ করে থেকেছি। আমি একবারও কোনো শক্তির কাছে বলিনি, আমাকে বাঁচাও– বা তুমি বাঁচিয়ে তুলছ। বরং আমার ছোট বোন যখন ডাক্তারদের মতোই বলছিল, তখন আমি বলেছি– সে যদি আমাকে বাঁচিয়েই থাকে তাহলে আক্রমণের দরকার ছিল কেন? আমি তাকে বলেছি, এসব বাজে কথা বলো না। ওসব অলৌকিক শক্তিতে আমার কোনো বিশ্বাস নেই। অত্যন্ত দক্ষ কয়েকজন খুনি মানুষ আমাকে আক্রমণ করেছে এবং আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছে আমার দৈহিক শক্তি, মনোবল বা সাহসিকতা এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। এ ছাড়াও সিএমএইচ হসপিটালের চিকিৎসকদের অসামান্য দক্ষতা। আমি শুনেছি, পঞ্চাশজন চিকিৎসক আমাকে বাঁচানোর জন্যে কাজ করেছেন। অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সেখানে যা রয়েছে, সেগুলো আমাকে বাঁচিয়েছে। কোনো ঐশ্বরিক শক্তি আমাকে বাঁচায়নি।

টেলিফোনে নেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি কথা বলেছিলেন থেমে থেমে। থাইল্যান্ডের বিখ্যাত চাওফিয়া নদীর পাড় থেকে বলা বহুমাত্রিক লেখকের কথাগুলো অস্ট্রেলিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে ভেসে আসছিল কেঁপে কেঁপে। অনর্গল কথা বলায় এক সময় তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। ব্যাংককে ছিলেন তিনি ক্লান্ত। ক্লান্ত শারীরিকভাবে। মানসিকভাবে তাঁর মতো দৃঢ় মনোবলের পুরুষ আর কেউ ছিল না পদ্মাপাড়ের দেশে।

মানসিক দৃঢ়তাই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল; অনেকেই বলেছিলেন সে কথা।

একজন লেখক তাঁর লেখার অপরাধে মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের আক্রমণে মৃত্যুশয্যায়। মৃত্যু তাঁর সিথানে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে; তাকে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে। সেই লেখক স্বপ্ন দেখছেন 'মৃত্যু থেকে কয়েক সেকেন্ড দূরে' নামের আরেকটি বই লেখার। সেই লেখক যদি হুমায়ুন আজাদ না হয়ে অন্য কেউ হতেন তাহলে আপনি সেই লেখক সম্পর্কে কি মন্তব্য করতেন? তাঁর সম্পর্কে কি ধারণা হতো আপনার?

হুমায়ুন আজাদ : আমার বইটির নাম অবিশ্যি মৃত্যু থেকে কয়েক সেকেন্ড দূরে নয়, 'মৃত্যু থেকে এক সেকেন্ড দূরে'। আর আমি ছাড়া বোধ হয় আর কেউ এমন স্বপ্ন দেখতেন না। আমার মতো আর কেউ আক্রান্তও হননি। গত একশ বছরে কোনো লেখক এভাবে আক্রান্ত হননি।

স্যার আপনি যখন খুনিদের দ্বারা আক্রান্ত হন তখনকার কোন স্মৃতি আপনার মনে আছে?

হুমায়ুন আজাদ: আমার শুধু মনে পড়ে, আমি আমার ছাত্রদের চিৎকার শুনেছিলাম। তারা চিৎকার করে বলছিল, এত আমাদের স্যার, হুমায়ুন আজাদ। আমার মনে আছে, কাটা পাঙ্গাস মাছের মতো টেনেহিঁচড়ে আমাকে তোলা হয়েছে পুলিশের গাড়িতে। আমি আঘাতপ্রাপ্ত হবার পরও আমার এক মেয়েকে চিনতে পেরেছি, আমার হাতের ঘড়ি, মানিব্যাগ, মোবাইল ফোন তাকে দিয়েছি এবং এক সময় তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি এখানে কি করছ? তখনো আমার চেতনা ছিল। খুনিরা আসলে আমার গলাই কেটে ফেলতে চেয়েছিল। আমার ঘাড়ের পেছনে খুব গভীর একটি ক্ষত রয়েছে। প্রতিদিন আমি বইমেলা থেকে দুটি বই নিয়ে ফিরতাম। সম্ভবত আমি ওই বই দিয়ে হামলাকারীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলাম। এজন্যে আমার মুখ, মাথা,বাহু কেটে গেলেও হাত কাটেনি।

নিষেধের দেয়াল ভেঙে তিনি অনর্গল কথা বললেন আমার সঙ্গে। বেশ কয়েকবার তাঁর কাশির শব্দ আমার কানের ভেতর দিয়ে বুকের কাছে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছে। টেলিফোনে কথা বলার মাঝখানে কয়েকবার তাঁর রুমে চিকিৎসক এলেন, নার্স এলেন, চা এলো।

একবার তিনি বললেন, চিকিৎসক এসেছে। সম্ভবত রক্ত নেবে; তুমি ততক্ষণ কথা বলো ওসমান গনির সঙ্গে। লাইন কাটার দরকার নেই।

তিনি যতদিন ব্যাংকক ছিলেন প্রায় প্রতিদিনই আমার সঙ্গে কথা হতো।

আপনি একজন বিচ্ছিন্ন একাকী মানুষ। আপনি বিচ্ছিন্ন সমাজ থেকে, মানুষ থেকে। সব কিছু থেকে। অথচ আপনি আক্রান্ত হবার পর দেশে এবং বিদেশে প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। জেগে উঠেছিল গোটা পৃথিবীর বাঙালি। যাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই তারাও কেউ কেউ ছুটে গেছেন মসজিদে, মন্দিরে। একজন বিচ্ছিন্ন মানুষের জন্যে গোটা পৃথিবীর বাঙালিদের এই ব্যাকুলতার কি কারণ?

হুমায়ুন আজাদ : আমি কারো ব্যাকুলতা এবং ভালোবাসার রূপটা দেখিনি। আমি তো প্রায় মৃতই ছিলাম। আমারও কয়েকজন প্রিয়, যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না; শুনেছি তারাও আল-হ–ভগবানের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করেছে। তারা আমাকে ভালোবেসে করেছেন। তবে তারা যুক্তিপরায়ণ মানুষ নন। ভালোবাসা তাদেরকে যুক্তি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আমি বরং খুশি হতাম যুক্তির সঙ্গে ভালোবাসা হলে। তবে তারা যে আমাকে ভালোবেসেছে এটা আমার জন্যে গভীর সুখের ব্যাপার। আমাকে তো মানুষ খুনও করতে চায়। আমি তো মরেও যেতে পারতাম, যা হয়েছিল। আমার বেঁচে থাকাটা বলা যায় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার জয়। আমি মরে গেলে আমি জানতামও না যে, আমার জন্য মানুষের মনে এতো আবেগ জেগে উঠেছিল। এখন আমি এটা জানছি। পত্র–পত্রিকায় অনেকের লেখা পড়ে দেখছি। আমি তো বিচ্ছিন্ন মানুষ; চিরকাল একাই থেকেছি। আমাকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিকর্মী এবং সারা দেশের মানুষ যে আবেগ অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠেছে সেটা অসামান্য ঘটনা। আমার ধারণা ছিল, আমি কোন জনপ্রিয় মানুষ নই। জনপ্রিয় মানুষ কখনো কোনো কিছুর বিরুদ্ধে বলে না। আমি তো বহু কিছুর বিরুদ্ধে বলেছি। রাজাকাররা ছাড়া সবাই আমার জন্যে আবেগ অনুভব করেছে। তারা হাহাকার করেছে, আমাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে সমস্ত চেষ্টা করেছে। এটা আমাকে সুখী করেছে; এমন কি মাঝে মাঝে এ কথা ভাবলে কান্নাও পায় যদিও আমি কাঁদতে চাই না।

আততায়ীদের দ্বারা আক্রান্ত হবার পর তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন 'মৃত্যু থেকে এক সেকেন্ড দূরে' এবং 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' নামে আরো দুটি বই লেখার। জার্মানে যাবার সময় তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর তিনটি কম্পিউটারের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ল্যাপটপটি।

কিন্তু তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছে পূরণ করে যেতে পারলেন না।

akidruchy@hotmail.com, mail@basbhumi.com